বাংলাদেশে বাম শক্তির ব্যর্থতা এবং করণীয়*

- *মোঃ আনিসুর রহমান*

"No social order ever disappears before all the productive forces for which there is room in it have been developed." – *Karl Marx.*

"For a mass of people to be led to think coherently...is...far more important ...than the discovery of some philosophical "genius" of a truth which remains the property of small groups of intellectuals." – *Antonio Gramsci*

"Reading it was an exciting experience for me. It indicates, I think, the direction in which revolutionary thought and practice must move. I was reminded througout of nothing so much as the "Thesis on Feuerbach", the true distillation of Marxist thought."

– *Paul M. Sweezy* (১৯৮২ সালে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব সোসিওলজিতে দেয়া 'পার'-এর ওপর কীনোট পেপার সম্বন্ধে)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস স্মারক বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মাণিত। এই বিভাগের শহীদ শিক্ষক গিয়াসউদ্দীন আহমদ ছোটবেলা খেকেই আমার বন্ধু ছিলেন, এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধে সহায়তা করবার কাহিনি আমি জানি। অন্যান্য শহীদদেরও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত অবদান স্মরণীয়। এঁদের কাছে জাতির ঋণ এবং এঁদের অকাল বিয়োগে জাতির ক্ষতি অপরিসীম। আমি এঁদের সবাইকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করছি, তাঁদের পরিবারবর্গের পরম দু:খের সাথী হিসাবে তাঁদের হাত ধরছি।

মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মত্যাগ শুধু দেশের স্বাধীনতার জন্য হয় নি, একটি সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের জন্য হয়েছিল। আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে এই আদর্শ থেকে অনেক, অনেক দূরে চলে এসেছি। আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীকার/স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে দেশের প্রগতিশীল ধারাসমূহের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের প্রতিশ্রুতির পেছনেও তাদের অবদান ছিল। দেশের মূল রাজনৈতিক ধারা জোতদার-অধ্যুষিত থাকলেও দেশের তরুণ সমাজ ও আপামর জনসাধারনের মধ্যে তারাই প্রগতিশীল আকাঙ্খা আনবার কৃতিত্বের দাবীদার। তবুও স্বাধীনতার পর তাদের কোথায় ভুল হলো এবং আজো হচ্ছে এবং তারা কী করতে পারেন? এই প্রশ্নের আলোচনাই আমার এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

স্বাধীনতার পর দেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাজাত প্রগতিশীল গণ-উদ্যোগ, এবং বাম ধারাসমূহের অবস্থান

অ-প্রথাগত গেরিলাযুদ্ধ-ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধ, যে যুদ্ধে সামরিক বাহিনি সহ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ছাত্র-যুব সমাজ ও সাধারণ জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে কঠিন কষ্ট ভাগ করে নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি ছাড়িয়ে বাস্তব সম্ভাবনায় এগিয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর দেশের অনেক স্থানে তরুণ সমাজ, ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায়, এমন কী কিছু সরকারী আমলাও সাধারণ জনগনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নানান্ রকম যৌথ উদ্যোগ-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নেমে গিয়েছিল, গেণাবাহিনীরও কিছু অংশ লাঙ্গল ধরেছিল - যেরকম কাজ সমাজতান্ত্রিক চেতনার মধ্যেই পড়ে বলেই আমার ধারণা। এধরণের অনেক কাজের বিবরণ *যে আগুন জ্বলেছিল* বইতে (রহমান ১৯৯৭) সংকলিত আছে যে বইটি এই বিভাগেরই 'জনইতিহাস চর্চা কেন্দ্র' একটি সেমিনার করে লঞ্চ করেছিল। অসংখ্য উদ্যোগের মধ্যে কয়েকটি উদ্যোগ ছিল: গুরুদাসপুরের 'গণমিলন' যেখানে বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের সমবায়-ভিত্তিক আর্থ-সামজিক অর্থনৈতিক ও গণশিক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়; ঠাকুরগাঁর কচুবাড়ী-কৃষ্টপুর গ্রামে শুরু হওয়া 'টিপ্ গণ ছি ছি' শ্লোগানধর্মী গণশিক্ষা আন্দোলন যেটি পার্শবর্তী অন্যান্য গ্রামেও ছড়াতে শুরু করেছিল; বগুড়ার তিতুমীর হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের লেখাপড়ার খরচ নিজেরা হোস্টেলের প্রাঙ্গনে চাষ-আবাদ ও অন্যান্য আয়-বহনকারী কর্মকান্ড করে তুলে অভিভাবকদের অর্থসাহায্যের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে হোস্টেলটি 'মুক্ত হোস্টেল' ঘোষণা করা; আর রংপুর জিলার ষাটটি গ্রামের 'স্বনির্ভর আন্দোলন' যে আন্দোলন বাইরের সবরকম সাহায্য নেবার বিরুদ্ধে শপথ নিয়ে গ্রাম-উন্নয়নের কাজে নেমে গিয়েছিল এবং যার চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের লঙ্গরখানা-বিরোধী ও দান-খয়রাত বিরোধী অসাধারণ মোকাবিলা (রহমান ১৯৯৭: ১০৭-১৩০) মাও জে দং-কে নিশ্চয় খুশী করতো। এসমস্ত উদ্যোগ ছাড়া একটি প্রগতিশীল এন,জি,ও - 'নিজেরা করি' - বিভিন্ন স্থানে বঞ্চিত মানুষদের তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য যোগযুক্ত করতে নেমে যায় যার কাজের মূল মন্ত্র ছিল মার্কসবাদের সঙ্গে পাওলো ফ্রেইরির 'কনশিয়েন্টাইজেশন'।

কিন্তু এধরণের কোন উদ্যোগেণ প্রাতিষ্ঠানিক বাম মহল ফর্মালি শরীক হয় নি। কিছু বাম শক্তি শেখ মুজিবকে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিয়ে যায়; কিছু শক্তি সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে 'বিপ্লব'এর প্রচেষ্টা চালায়। মুজিব হত্যার পর একটি জনবিচ্ছিন্ন 'বাম' শক্তি 'সিপাই বিদ্রোহের' মাধ্যমে এবং শেষ পর্যন্ত এক দক্ষিণপন্থী সামরিক জেনারেলের হাতেই নেতৃত্ব তুলে দিয়ে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' হাস্যকর চেষ্টা করে। এর অনেক খেসারতের মধ্যে গণমিলন ও রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলনও সামরিক বাহিনির হাতে বিধ্বস্ত হয় এবং নতুন সরকার গুছিয়ে বসলে আর মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হতাশায় স্তিমিত হতে থাকলে অন্যান্য গণউদ্যোগধর্মী স্বত:স্ফূর্ত আন্দোলনগুলিও আস্তে আস্তে নিভে যায়।

মনে হয় দেশের প্রতিষ্ঠিত বাম ধারাগুরি এদেশে একটা বিরাট তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে-যে একটি নতুন স্বত:স্ফূর্ত অত্যন্ত প্রগতিশীল চেতনা ও স্পৃহা দেশের মাটি থেকেই বাস্তব উদ্যোগ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল তার তাৎপর্য তেমন যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করে নি। সমাজতন্ত্রের বইতে উৎপাদন-সম্পদের মালিকানার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হবে এই তত্ত্ব রয়েছে বিধায় এদেশের বাম মহলের মনে এই ধারণা বোধ হয় বদ্ধমূল হয়েছিল যে সমাজ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হতেই হবে সম্পদের মালিকানার পুনর্বন্টন। বলা বাহুল্য এতে তৎকালীণ জোতদার সরকার অবশ্যই রাজী ছিল না মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি যাই থাকুক না কেন। কিন্তু এদেশে বৈষম্য-বিরোধী চেতনা নিয়ে দীর্ঘকালীন স্বাধিকার সংগ্রাম, নেতৃত্বের কাছ থেকে সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি এবং সমাজে সব শ্রেণীর মানুষ এক ট্রেঞ্চে শুয়ে-বসে

মুক্তিযুদ্ধ করা এমন একটা চেতনাগত অবস্থার দিকে দেশকে এগিয়ে দিয়েছিল যে তখন তখনি আইনগতভাবে সম্পদের মালিকানা স্পর্শ না করেও দেশে যৌথ সৃষ্টিশীলতাধর্মী এবং অন্যান্য প্রগতিশীল মূল্যবোধধর্মী উদ্যোগের জন্য অনুকূল একটা সময় এসে গিয়েছিল। এমন কি, এরকম উদ্যোগের ফসলও সব ক্ষেত্রে চিরাচরিত হারে উৎপাদন-সম্পদের মালিকদের ঘরে উঠে যাচ্ছিল না - এই ফসলের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে কম-বেশি গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছিল। এরকম উদ্যোগ চলতে থাকলে এবং দেশব্যাপী বিস্তৃত হলে, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন ক'রে অনুপ্রাণিত তরুণ ও ছাত্রসমাজ এরকম উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে গেলে এদের ফসলের ওপর গণ-অধিকারের চেতনা আরো বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা ছিল। উপরিকাঠামোতে জোতদার সরকারের রাজত্ব থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র, প্রতিশ্রুতি এবং তদ্‌জাত প্রেরনার জন্য এই উপরিকাঠামোর শক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল বিধায় দেশে নতুন প্রগতিশীল পথে উৎপাদন শক্তির বিকাশ শুরু হয়ে গিয়েছিল যার গতি গেণ উপরিকাঠামোর পক্ষে রোধ করা সম্ভব ছিল না।

এভাবে সমাজে নবজাগ্রত প্রগতিশীল মূল্যবোধকে মাঠ-পর্যায়ে বাস্তব আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করবার কাজে দেশব্যাপী জোয়ার আনবার লক্ষ্যে এবং এরকম কাজের প্রত্যয়গত ও ব্যাবস্থাপনাগত মান উন্নত করবার লক্ষ্যে দেশের প্রগতিশীল মহল যদি এগিয়ে আসতো, তাহলে শুধু কথায় বা আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতায় নয়, বাস্তব সমাজ-জীবনে প্রগতিশীল মূল্যবোধধারী সক্রিয় শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বন্দ্ব তীব্রতর হতে থাকতো যাতে সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাড়তো বলেই সাজেস্ট করা যায়। কিন্তু এভাবে এরকম একটি ঐতিহাসিক মুহুর্ত এসে সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাজ-প্রগতির আরো অনুকূলে আনবার যে ঐতিহাসিক সুযোগ দিয়েছিল তাকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল/বিপ্লবী মহল কব্জা করতে চেষ্টা করে নি।

শেষ পর্যন্ত চরম দক্ষিণপন্থীর হাতে শেখ মুজিব হত্যার পর কয়েক বছর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে সমাজ অনেকখানি পিছিয়ে পড়লো, দেশে বৈষম্যও আকাশের দিকে হাত বাড়ালো। মুক্তিযুদ্ধের পরপর যে জনগণ নিজেদের দরিদ্র জ্ঞান না ক'রে যার যা ছিল তাই নিয়েই দেশ গড়বার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এবং পড়তে প্রস্তত ছিল তাদেরকে বলা হলো তারা 'দরিদ্র' এবং তাদের দারিদ্র দূরীকরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। একথা শুনে শুনে জনগণ তাদের এই পরিচয়টাই আত্মস্থ করলো, দারিদ্র-রেখার ওপারে - যে দারিদ্র-প্রত্যয়কে আমি একটি গবাদি-পশু-প্রত্যয় বলে আসছি (রহমান ২০০৪) - বসে পড়লো কবে প্রসাদ পেয়ে এপারে আসতে পারে সেই প্রত্যাশায়। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের যে মানুষ বলে নি 'আমরা গরীব' তাদের শেখান হল তারা গরীব।

বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্রের (আপাত:) পরাজয়

এরপর এলো বিশ্বমঞ্চেই সমাজতন্ত্রের পরাজয়। তাও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো রায়- "এ নয় সমাজতন্ত্র"। পোল্যান্ডে জাতীয় শ্রমিক সংগঠনই কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো - একী রহস্য!

রাশিয়ার চিঠি-তে রবীন্দ্রনাথ সে দেশ ঘুরে এসে ইনটুইটিভ্‌লি বলেছিলেন যে এই 'ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব' টিঁকতে পারে না । কিন্তু বাংলাদেশের বাম ধারাসমূহ বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আজো প্রকাশ করেছে বলে আমার জানা নেই, এই বিশ্লেষণ ক'রে আত্মসমালোচনা ক'রে বাম

শক্তির বর্তমান সময়ে অবস্থান দায়িত্ব ও কৌশল নতুন ক'রে চিন্তা ক'রেও জনগণকে মনে হয় জানায় নি (সাম্প্রতিক একটি ব্যতিক্রমী লেখা: আকাশ ২০০৯)। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভুলটা কোথায় হয়েছে যার জন্য তার এমন শোচনীয়ভাবে, সমাজের ভেতরের আন্ত:র্দ্বন্দ্বেই, পরাজয় হলো তার বিশ্লেষণ করে বিপ্লবী তত্ত্বকে নতুন করে ঢেলে জনগনের কাছে নির্ভরযোগ্য করে পেশ করতে না পারলে জনগণই বা তাদের পেছনে দাঁড়াবে কেন।

<u>ভ্যানগার্ড পার্টি তত্ত্ব, 'পার' এবং গ্রামসী</u>

আমি অন্যত্র বিশ্লেষণ করেছি যে (রহমান ১৯৮৯) বিশ্বে আনুষ্ঠানিক সমাজতন্ত্রের পতনের মূলে লেনিনের 'ভ্যানগার্ড-পার্টি' তত্ত্বের দায়িত্ব রয়েছে। মার্কস চেয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর নিজের উদ্যোগেণ বিপ্লব হবে, কিন্তু তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন এটা অতো সহজ নয়। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীও অনেক সময়েই অ-বিপ্লবী ট্রেড্ ইউনিয়নিজমের দিকে ঝুঁকে যায়। আর শ্রমিক-কৃষকদের শুধু নিজেদের চেষ্টায় দেশব্যাপী সংগঠন ক'রে বিপ্লবের প্রচেষ্টা করা সময় ও সম্পদের দিক দিয়েও কঠিন, এজন্যও প্রগতিশীল মধ্যবিত্তদের সহায়তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু লেনিন এই বিবেচনাটাকে ঘুরিয়ে একটা 'ভ্যানগার্ড'-তত্ত্ব দিয়ে দিলেন যে 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবিরাই এসব ব্যাপার বেশি বোঝে, তাই তারাই শ্রমিকদের শিখিয়ে পড়িয়ে বুদ্ধিগত পর্যায়ে 'ওপরে' <u>তুলবেন</u>, তারা নিজেরা শ্রমিকদের বুদ্ধিগত পর্যায়ে <u>নামবেন</u> না (লেনিন ১৯১৮:২০৫)। এর ফলে বাম শক্তিবর্গ শ্রমিক শ্রেণীকে যা শেখাতে থাকলো তা কতগুলো বাঁধা বুলি যা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে সম্মানজনক নয় এবং সমাজে একটি বুদ্ধিগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

আমি এও বলেছি যে, প্রথমত:, কেউই সব কিছু অপরের চাইতে বেশি বোঝে না, কোন বিষয় বেশি বোঝে, কোন বিষয় কম। দ্বিতীয়ত:, সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের মতো একটা 'জ্ঞান-সম্পর্ক'ও রয়েছে, যেখানে 'জ্ঞানের মালিকানা'র বন্টনও অত্যন্ত অসম, এবং এই মালিকানার জোরে একটি বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সাধারণ জনগনের ওপর প্রভুত্ব করে যে প্রভুত্ব শুধু উৎপাদন সম্পর্কে বিপ্লব হলেও থেকে যায় এবং বাড়তেও থাকে যদি এ সম্বন্ধেও সচেতনতা ও এ ব্যাপারে সমতা আনবার প্রক্রিয়া না থাকে। এরকম ইঙ্গিত প্রক্রিয়াকে <u>পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ</u> ('পার') বলা হচ্ছে, যে প্রক্রিয়ায় শোষিত শ্রেণীকেও তাদের নিজেদের গবেষণা করতে আহবান করা হয় (রহমান ১৯৮২)। লাতিন আমেরিকায় আমার বন্ধু সহকর্মী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি-একটিভিস্ট 'লোকালি ইনস্পায়ার্ড সমাজতন্ত্রের' - 'দেশজ প্রেরণাজাত সমাজতন্ত্র' - স্বপ্নদ্রষ্টা পরলোকগত অরল্যান্দো ফালস বর্দার নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণায় ওই মহাদেশের কয়েকটি দেশে - বিশেষ ক'রে কলম্বিয়া, মেক্সিকো ও নিকারাগুয়ায় - 'পার' সমৃদ্ধি লাভ করেছে (ফালস্ বর্দা ১৯৮৮)। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় মার্ক্সিস্ট বুদ্ধিজীবি মান্থলি রিভ্যু পত্রিকার প্রাক্তণ সম্পাদক পরলোকগত পল সুইজীও জ্ঞান-সম্পর্কের এই তত্ত্ব এবং পার-এর প্রত্যয়কে স্বাগত জানিয়ে বর্তমান প্রবন্ধকারকে লিখেছিলেন (প্রবন্ধের শুরুতে তৃতীয় উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

১৯৭০ দশকের শেষ দিক থেকে বিশ্বের নানা দেশে তৃণমূল কাজে 'পার' পদ্ধতির প্রয়োগ হতে থাকে (রহমান ২০০৮)। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন বিশ্বকে এক মেরুর অধীনে নিয়ে আসে এবং বিশ্বব্যাপী বামধারা দিশাহারা হয়ে যায়। আমার নিজের বিশ্লেষণে 'ডিকটেটরশিপ অব দি প্রোলেতারিতের' নামে বুদ্বিজীবি ও আমলাদের একনায়কত্ব পূর্ব ইউরোপে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ। আর চীনে মাও জে দং-এর মৃত্যুর পর পরই যে 'বিড়ালের রং' বদলে গেল তার কারণ অনুসন্ধানে 'লিট্ল্ রেড বুক্'-কে *পিপলস্ থট্* না বলে *মাও জে দং-এর থট্* বলবার গভীর তাৎপর্য চিন্তা করবার মতো -

মাও চলে গেলে পিপল্‌ তো তাই বসে থাকলো এবার কার থট্‌ অনুসরণ করবে এই প্রশ্ন নিয়ে। (আমার সমাজতন্ত্রের পতনের এই বিশ্লেষণের সঙ্গেও পল সুইজী এবং তাঁর মান্থলি রিভ্যু-এর সহযোগীরা একমত পোষণ করেছিলেন (রহমান ২০০৭: ২৪৮))। আর আমি নিজে বার্লিন দেয়ালের পতনের পর পরই হাঙ্গেরির একটি গ্রামে একটি 'পার' প্রজেক্ট পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেছিলাম সেখানে মানুষদের কোন কিছু আলোচনা করবার জন্য একত্র করা কী ভীষণ কঠিন হয়ে গিয়েছিল - তারা ওপর থেকে খবরদারিতে এতকাল এমনই আতঙ্কিত জীবন যাপন করছিল যে তাদের দেশে 'সমাজতন্ত্র' আসবার আগে তাদের যে পারস্পরীক আলাপ-আলোচনার নিজস্ব ঐতিহ্য ছিল তাও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এমনই সেখানকার এতদিনকার 'সমাজতন্ত্র' তথা 'কম্যুনিজম'-এর মহিমা!

'পার'-এর মূল দর্শন - প্রত্যেক মানুষেরই জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এবং তা অনুশীলনে আরো বিকশিত হতে পারে - গ্রামসীর দর্শনের সঙ্গে একাত্ম (এই প্রবন্ধের শুরুতে দ্বিতীয় উদ্ধৃতি দেখুন)। বিশ্বের অনেক বাম মহলকে আজকে গ্রামসীর চিন্তা প্রভাবান্বিত করছে। তবে গ্রামসী জনগনের মধ্যে অগ্রসর চিন্তাধারী 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়ালের' নেতৃত্ব চেয়েছেন, যাদের তিনি জনগনের মধ্য থেকে উদ্ভুত একটি নতুন ধরণের *এলিট* ইনটেলেকচুয়াল শ্রেণী আখ্যায়িত করেছেন (গ্রামসী ১৯৭১: ৩৪০)। 'পার' শোষিত জনগনের সবাইকে যৌথভাবে আর্থ-সামাজিক-গবেষণা করতে আহবান করছে এবং তাদের যৌথ চিন্তাকে ও যৌথ নেতৃত্বকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, এবং শোষিতদের কালেক্টিভের কাছে তাদের নিজেদের নেতৃত্বেরও জবাবদিহিতা চাচ্ছে। (মার্কসের "রাষ্ট্রের বিলুপ্তি" প্রত্যয়ও সরাসরি জনগণের কালেক্টিভের 'ফ্রী এসোসিয়েশন' চেয়েছে।) বাস্তবে 'পার'-প্রক্রিয়া থেকেই অনেক স্থানে 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল' গড়ে ওঠে, এবং অনেক স্থানে এরকম কোন ব্যক্তির একক নেতৃত্ব এসে পড়ে যা দীর্ঘস্থায়ীও হয়ে যেতে পারে। এরকম একক নেতৃত্ব সব সময় কালেক্টিভের স্বার্থে কাজ নাও করতে পারে, এবং শোষক শ্রেণীকেও সহজতর সুযোগ দিতে পারে তাকে বিপথে নেবার। এইজন্য 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল'দেরও জনগনের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (রহমান ২০০০: ১১৫)। ভারতের মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত 'ভূমিগেণা' আন্দোলনে নেতৃত্ব ও জনগনের মধ্যে এরকমই সম্পর্কের বিবরণ প'ড়ে (ডি সিল্‌ভা ও অন্যান্য ১৯৭৯) অরল্যান্দো ফালস্‌ বর্দা এই আন্দোলনেই 'পার'-এর মূল নীতিগুলি প্রকাশ পেয়েছে বলে বিচার করেন (ফালস্‌ বর্দা ২০০১:২৭)। ভূমিগেণার নেতা কালুরাম - একজন অসাধারণ 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল' - আমাকে বলেছিলেন 'আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে যখন জঙ্গলপট্টির মানুষরা উঠে দাঁড়াবে, তখন আমাকে আর প্রয়োজন হবে না, আমি ওদের একজন হয়ে ওদের মধ্যে মিশে যাব'।

এদেশে ২০০২ সাল থেকে দারিদ্র-গবেষণা-সাপোর্ট সংস্থা রিইব (রিসার্চ ইনিয়েটিভ্‌স বাংলাদেশ) - এর উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে 'পার' প্রক্রিয়া শুরু হয় যে- প্রক্রিয়াকে সরাসরি 'গণগবেষণা' বলা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের নানা স্থানে 'রিইব' ও রিইব-এর হাত ধরে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে পিছিয়ে-থাকা মানুষদের গণগবেষণা চল্‌ছে। এর ফলে দেশের নানা স্থানে বহু পিছিয়ে থাকা মানুষ - মূল ধারায় শুধু নয়, দেশের বেশ কিছু অন্ত্যজ/অস্পৃশ্য গোষ্ঠীদের মধ্যেও - নিজেদের সংগঠন বা সলিডারিটি গ্রুপ সৃষ্টি ক'রে অন্যায়-অবিচার-অস্পৃশ্যতা-নারী-নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং আর্থসামাজিক-শিক্ষাগত উদ্যোগ নিয়ে সমাজে তাদের স্থান আগের চেয়ে উন্নত করছে। উদাহরণস্বরূপ কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে অন্ত্যজ সম্প্রদায়দের মধ্যে গণগবেষণা ক'রে লক্ষ্যনীয় জাগরণ; নীলফামারির মঙ্গা-পীড়িত অঞ্চলের কৃষকদের গণগবেষণার মধ্য দিয়ে একত্র হয়ে লাক্ষা ও ব্রি-৩৩ চাষ ক'রে মঙ্গা থেকে মুক্ত হওয়া (*দি ডেইলি স্টার* ২০০৯), কুয়াকাটায় সাড়ে তিনশ'র ওপরে গণগবেষক মৎস্যজীবিদের দুটি সমবায় সমিতি ক'রে নিজেদের মাছ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে 'রাখি বিজনেস' শুরু করা ('উদ্বৃত্ত নিজেরা রাখি', যা

মার্কসকে নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দ দিতো), আড়তদার-দাদনদারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, এবং সার্বিকভাবে গণগবেষণায় অংশগ্রহণকারী মৎস্যজীবিদের মধ্যে আত্মজাগরণ যা স্থানীয় জনগণকে ও পর্যবেক্ষণকারীদের বিস্মিত করেছে (খান ২০০৯); কোলকোন্দ ইউনিয়নে চার গ্রামের গণসংগঠনের সমন্বয়ে সমবায় কনজুমার স্টোর ক'রে আর এক ধরনের 'রাখি বিজনেস'; মুক্তিনগর ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ সহ বিভিন্নরকম নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী গণগবেষকদের সংগঠিত আন্দোলন (মাহমুদ ২০০৭:৬৮) ইত্যাদি শত শত গণগবেষণাজাত গণউদ্যোগ (১)।

সব জায়গায় গণগবেষণা আশানুরূপ কাজ করছে সেরকম কোন দাবী নেই - অনেক স্থানেরই এরকম কাজের আরো অনেক উন্নতি হতে পারে যেজন্য প্রগতিশীল ও যোগ্য এনিমেটর/সহায়ক কর্মীর প্রয়োজন। তবে গণগবেষনা হচ্ছে এরকম সব স্থানেই তারাও যে 'গবেষণা' করতে পারে এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিচয়টিও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বিশেষ আত্মগর্ব ও মানসিক শক্তি দিচ্ছে।

অন্যদিকে জনগনের নিজস্ব চিন্তাকে শ্রদ্ধা করা, এবং এই চিন্তাকে আরো অগ্রসর হতে সাহায্য করা যা 'পার'-এর উদ্দেশ্য, তার কোন পরিচয় এদেশের আনুষ্ঠানিক বাম মহলের কথায়-কাজে বোধ হয় তেমন প্রতিফলিত হয় নি। তাঁরা যেন জনগণকে ঘেরাও-বন্ধ ইত্যাদির জন্য মবিলাইজ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করেন। আর 'সর্বহারা' কথাটি যা তাদের অনেকেই ব্যবহার করেন এটি তো বঞ্চিত মানুষদের বুদ্ধি-ক্ষমতার ওপর একেবারেই শ্রদ্ধাশীল নয় এবং তাদের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা-বোধের জন্য পরম ক্ষতিকর - এই সম্বোধন এই শ্রেণীর মুক্তির জন্য অন্য কোন শ্রেণীর ওপর নির্ভর ক'রে থাকতেই আহ্বান করে না কি। (মার্কস 'প্রলেটারিয়েট কথাটি ব্যবহার করেছেন এলিয়েনেটেড্ প্রডাক্টিভ্ ফোর্স অর্থে যার বর্তমানে শুধু শ্রম ক্ষমতা আছে কিন্তু যে ক্ষমতায় আসলে তার নিজের ইতিহাস নিজেই রচনা করতে পারবে।)

সাম্প্রতিক কালের স্বত:স্ফুর্ত গণগবেষণা ও গণ-প্রাকসীস্

অবশ্য 'পার' হলো বাইরে থেকে কোন মহলের প্রচেষ্টা বঞ্চিত শ্রেণীদের নিজস্ব যৌথ গবেষণা ও তদ্জাত কর্মকান্ত প্রণোদিত করবার জন্য। অন্যদিকে দেশের বহু স্থানে বঞ্চিত মানুষরা নিজেরাই একত্রে নিয়মিত আলোচনা-বৈঠক ক'রে নিজেদের জীবন এগিয়ে নেবার জন্য নানারকম সৃষ্টিশীল যৌথ উদ্যোগ নিয়ে চলেছে যাকে স্বত:স্ফুর্ত গণগবেষণা ও গণ-প্রাকসীস্ (একত্রে আলোচনা, কাজ ও কাজের বিশ্লেষণ) বলা যায়। এরকম উদ্যোগের পেছনে কোন এক বা একাধিক স্থানীয় ব্যক্তির অগ্রণী ভূমিকা থাকতে পারে, তবে সবাই মিলে আলোচনা ('গবেষণা') করেই উদ্যোগগুলি নেয়া এবং তাদের তত্ত্বাবধান করা হয়। সম্প্রতি রিব-এর উদ্যোগে দেশের ৭০ জনের মতো সাংবাদিককে দিয়ে সমস্ত দেশময় বঞ্চিত মানুষের নিজেদের জীবন নিজেদের চেষ্টায় এগিয়ে নেবার বিভিন্ন উদ্যোগের সন্ধান করা হয় যা থেকে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাময় কিছু গণউদ্যোগ চিহ্নিত হয় (তাহমিনা ও অন্যান্য ২০০৮)। লক্ষ্যনীয় যে এসমস্ত উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধজাত অনুপ্রেরণা থেকে নয় - পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরই এদের জন্ম। উদাহরণস্বরূপ, আশীর দশকে ঝিনাইদহে কালিগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচান্দা গ্রামের কৃষকরা ও তরুণরা তাদের গ্রামে একটা বড়ো রকমের ভূমি সংস্কারই ক'রে ফেলেছে যা প্রায় অবিশ্বাস্যই - তারা সর্বোচ্চ ফলনের জন্য গ্রামে জমি স্বেচ্ছায় পুনর্বন্টন করে, আইল উঠিয়ে দেয় এবং আধুনিক পদ্ধতিতে যৌথ চাষ ক'রে গ্রামে 'কৃষি বিপ্লব' করে, তা ছাড়া আরো অনেক খাতে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে গ্রামে একটা অত্যন্ত প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক 'বিপ্লব'ই ঘটিয়ে ফেলে। কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে তিনটি উপজেলায়

সাতটি গ্রামের ৩৫০টির মতো চাষী তাদের বর্ষায় পানিতে-ডোবা ধানী জমি একত্র ক'রে 'নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচান' এই শ্লোগান দিয়ে যৌথ মাছ চাষ ক'রে আর একটি বড়ো ঘটনা ঘটিয়েছে। নিজেদের শিক্ষা উন্নত করবার জন্য ডিহি ইউনিয়নের সর্ষা উপজেলার অল্প আয়ের ক্ষেতমজুররা নিজেরা চার আনা-আট আনা ক'রে চাঁদা দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরী করেছে যেটা শুধু বই পড়বারই জায়গা নয়, এই অভিনব লাইব্রেরী বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্যচর্যা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নেবারও ব্যাবস্থা ক'রে লাইব্রেরীর সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছে শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যা বাড়াবার জন্য নয়, সার্বিক জীবনের এবং গণ-উৎপাদন শক্তির বাস্তব উন্নতির জন্য শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এই সংজ্ঞাকে পুনির্নমান ক'রে, এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এরা স্বত:স্ফূর্ত শ্রেণী সচেতনতা থেকে ধনী লোকদের কাছ থেকে কোন সাহায্য নেয় না তারা দিতে চাইলেও । যৌথ উদ্যোগে পাঠাগারের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। গাইবান্ধার সাহাপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানেরই ব্যতিক্রমধর্মী নেতৃত্বে ইউনিয়নের মানুষরা বিশেষ ক'রে তরুণরা অনেক রকমের আর্থ-সামাজিক যৌথ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে বেশ কয়েক বছর ধরে । দেশের বহু স্থানে অত্যন্ত নিম্ন আয়ের মানুষরা নিজেদের গ্রুপ সঞ্চয় ও ঋণ ফান্ড চালু করেছে - সারা দেশে এরকম হাজার হাজার গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে - এরকম ফান্ড তারা নিজেরাই ম্যনেজও করছে যার মধ্যে এন,জি,দের মতো শোষণমূলক ঋণ নেই এবং ঋণের ফসল গ্রুপের সদস্যরাই পাচ্ছে। জামালপুরে শহরের উপকণ্ঠে ছয়টি গ্রামে এবং সংলগ্ন এলাকায় দু:স্থ নারীরা উন্নত চুলা তেরীর প্রযুক্তি শিখে নিয়ে ৭০টি মহিলা সমিতি গঠন করেছেন এবং এর দৃষ্টান্তে ২০ টি পুরুষ সমিতিও গঠন হয়েছে, যারা উন্নত চুলা প্রযুক্তি ছড়ানো ছাড়াও নিজেদের সঞ্চয় ফান্ডও গঠন ও ম্যানেজ করছেন। অনেক স্থানেই নিম্নবিত্ত অভিভাবকরা সমবায়-সমিতি ক'রে নিজেদের সন্তানদের জন্য স্কুল ক'রে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করছেন।

এরকম বহু স্বত:স্ফূর্ত গণ-উদ্যোগ ও গণপ্রাকসীস্ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশে সামরিক শাগণ আসবার পর তৃণমূলে গঠনমুলক গণউদ্যোগ কিছুকাল পিছিয়ে গেলেও বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে কিছু কিছু অংশ নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নেবার জন্য আবার নানারকম যৌথ আর্থসামাজিক উদ্যোগ নেয়া শুরু করেছে - "পুরানো সমাজব্যবস্থারই গর্ভে" যা মার্কসকে নিশ্চয়ই আনন্দ দিত - , এবং এই অর্থে এসব স্থানে উৎপাদন-শক্তি প্রগতিশীল পথে এগুচ্ছে।

একটি সংস্থা - 'নিজেরা করি' যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি - স্বাধীনতার পর থেকেই বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে প্রগতিশীল কাজ শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই সংস্থার ছত্রছায়ায় আজকে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় সাড়ে বারো হাজার সমিতির সদস্যদের সম্পদ ও সেবার অধিকার আদায়ে উন্নতি হচ্ছে, এবং তারা নিজেরাও বহু জায়গায় যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগ - যৌথ ধান মাছ হাঁস-মুরগী চাষ, শ্যালো পাম্প ও ক্র্যাসার মেশিণ স্থাপন, তাঁত বোনার কারখানা, ছোট ব্যবসা, এবং নিজেদের গ্রুপ সঞ্চয় ফান্ড সৃষ্টি ও পরিচালনা - নিয়ে চলেছে, এবং এতে তাদের লক্ষ্যনীয় আর্থ-সামাজিক উন্নতি হচ্ছে (বরকত ২০০৮: ৩৬১-৩৬৬)। বলা বাহুল্য 'নিজেরা করি'র কাজেও স্বত:স্ফূর্ত গণগবেষণা তথা গণ-প্রাকসীস্ প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

করণীয় কী

এরকম অবস্থায় দেশের প্রগতিশীল তথা বাম মহলের করণীয় কী। আমি চারটি ব্যাপারে বিশেষ জোর দেব:

১. মনের দরজা-জানালা খুলে দেয়া

গত বছরের এপ্রিল মাসে আমি বাম মহলেরই আমন্ত্রণে তাদের ফোরামে *আমাদের খাদ্য সংকট মোকাবিলার পথ* - শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিই যাতে এদেশের গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের এবং বর্তমান সময়েরও কয়েকটি অত্যন্ত সৃষ্টিশীল উদ্যোগের কথা এবং তার থেকে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা নেবার কথা বলি। সভায় প্রায় দুশো জন তরুণ বাম কাডার ছিল। আমার বক্তৃতা ও বাম মহলের কিছু ভারী ব্যক্তির আলোচনার শেষে আমি এই তরুণদের আহ্বান করি আমার বক্তব্য আলোচনা/সমালোচনা করতে। এতে কোনই সাড়া না পেয়ে আমি অত্যন্ত অবাক হই - মনে হয় এরা যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা-আলোচনা করতে তেমন অভ্যস্ত নয় এবং এব্যাপারে যেন তাদের কোনরকম উৎসাহ দেয়া হয় নি।

এদেশের প্রগতিশীল মহলের লেনিন-স্তালিনিজ্‌ম্- এর বাইরে অন্যান্য মার্কসীয় দার্শনিক - যেমন রোজা লুক্সেনবার্গ, গ্রামসী, ইত্যাদি, বিশেষ ক'রে রুশ বিপ্লবের পর লেনিন-স্তালিনের সঙ্গে যাদের গভীর দ্বিমত হয়েছিল তাদের চিন্তা-বিশ্লেষণ - গ্রহণ করতে হবে এমন কথা নেই কিন্তু পুনর্বিবেচনা করবার জন্য - পড়া ও তা নিয়ে ব্রেণ-স্টর্মিং প্রয়োজন। হো চী মিনের মতো বাস্তব বিপ্লবী নেতা যারা মানুষের জীবনের মধ্যে থেকে বিপ্লবের কাজ করেছেন তাদের চিন্তার সঙ্গেও গভীর পরিচয় এবং তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। অতীতের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শুধু গুণ-গান নয়, সমালোচনামূলক আলোচনাও করা অত্যন্ত প্রয়োজন আর কিছু না হলেও নিজেদের চেতনা ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা শাণিত করবার জন্য; চে গুয়েভারার রুশ সমাজতন্ত্রের সমালোচনা আলোচনা প্রয়োজন - যে সমালোচনায় তিনি এই সমাজতন্ত্রকে "স্টেটাইজ্‌ড্ ইমিটেশন অব বুর্জোয়া কনজুমার সোসাইটি" বলেছিলেন (*দি মান্থলি রিভ্যু* মার্চ ১৯৭৪ পৃ ৬০)। পাওলো ফ্রেইরির দর্শনও আলোচনা প্রয়োজন, যার 'শিক্ষায় ব্যাঙ্কিং' প্রত্যয় মুখস্থ মার্কসীয় বুলি শেখানোর ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আর দেশ-বিদেশে 'পার', লাতিন আমেরিকায় অরল্যান্দো ফাল্‌স্ বর্দার ভাষায় 'লোকালি ইন্সপায়ার্ড সোসালিজম্' আন্দোলনের এর বিন্যাস, দেশের ভিতরে সমাজের অগ্রগতির জন্য উৎপাদন-শক্তির বিকাশ-ধর্মী বিভিন্ন ধরণের কাজের তাৎপর্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা (যা আজকে ইনটারনেটেই পাওয়া যায়) ও আলোচনা প্রয়োজন।

২. বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সঙ্গদান ও প্রাকসিস্

দেশের নানা স্থানে বঞ্চিত মানুষদের যেসব যৌথ উদ্যোগ চল্‌ছে সেগুলির সঙ্গে প্রগতিশীল শক্তিবর্গ কেন সম্পৃক্ত হবে না, এক জায়গার এরকম কাজের অভিজ্ঞতা অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে না এরকম কাজের বিস্তার ঘটাতে, এবং নিজেরাও এরকম কাজ উজ্জীবিত করতে ও তাদের সহায়তা দিতে মাঠে নামবে না। বর্তমান যুগে (আপাতত:) বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্র পরাজিত, কোন দেশে সমাজতন্ত্র আসবার অথবা আনবার প্রশ্ন বিশ্লেষণে বর্তমানে আর কোন ছক নেই। রাশিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা একথারও হয়তো ইঙ্গিত দিচ্ছে-যে প্রাক-পুঁজিবাদী দেশে 'সমাজতান্ত্রিক' বিপ্লব সেসব দেশে পুঁজিবাদে উত্তরোনেরই একটা দ্রুততর সোপান হিসাবে কাজ করতে পারে, সেসব দেশকে স্থায়ী সমাজতন্ত্রে তুলতে নাও পারতে পারে। এ অবস্থায় প্রগতিশীল শক্তিবর্গের দায়িত্ব সমাজ যেখানে আছে সেখান থেকে শোষিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজ ক'রে যাওয়া। এই কাজ সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে

সমাজ পরিবর্তনের কোন তত্ত্ব আউড়ে নয়, মানুষকে শুধু তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে মিছিল-সমাবেশ-ঘেরাও-বন্ধ করতে নেতৃত্ব দিয়েও নয়, শোষিতদের বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে গেণ জীবনকে প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক ক্রিয়ায় মাধ্যমে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে যাবার কাজ। এই প্রক্রিয়ায় শোষিতদের জীবন এরকম সহায়তা ছাড়া যে গতিতে এগুবে তার চেয়ে দ্রুত এগুবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আসবে; এই প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষের সম্মিলিত শক্তিও বাড়তে থাকবে সমস্ত সমাজকে আরো প্রগতিশীল পথে নিয়ে যাবার। আর এই প্রক্রিয়ায় প্রগতিশীল শক্তিবর্গের এবং শোষিত শ্রেণীর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে থাকবে গেণ অভিজ্ঞতা, যদি ইতিহাস কোনদিন সমাজে বড়ো রকমের পরিবর্তনের সম্ভাবনা এনে দেয় তাহলে সেরকম পরিবর্তনের পর নতুন সমাজ গঠনের জন্যেও তাদের অনেক বেশি দক্ষ ও প্রস্তুত করে তুলবে, যে প্রশ্নে লেনিন রুশ বিপ্লবের পর আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণী নতুন সমাজ গঠনের জন্য প্রস্তুত নয়। তাছাড়া, যদি কোনদিন বড়ো রকমের সমাজ পরিবর্তন হয় তারপর নতুন সমাজ গঠনের চ্যালেঞ্জটি এবং এর জন্য শুধু শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নেই নয়, সহায়ক শক্তি হিসাবে বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবিদেরও যোগ্যতার প্রশ্নেও প্রস্তুতির প্রশ্নটি মনে হয় এযাবৎ বাম মহলে কমই আলোচিত হয়েছে যে প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম ।

এদেশের বাম শক্তিবর্গ কোন কোন বিচ্ছিন্ন স্থান বাদ দিয়ে শোষিতদের দৈনন্দিন জীবন উন্নয়নের সংগ্রামে তাদের হাত ধরে নেই একথা বোধ হয় জেনারেল স্টেটমেন্ট হিসাবে বলা যায়। এদেশের শীর্ষস্থানীয় বাম বুদ্ধিজীবিরাও নেই। আমাদেরই পার্শ্ববর্তী দেশের কেরালায় কয়েক যুগ ধরে 'সায়েন্স ফর সোসাল রিভল্যুশন' আন্দোলনে প্রতি বছর দেশের বুদ্ধিজীবি-বৈজ্ঞানিকগণ-ও-ছাত্র-সমাজ বড়ো ছুটিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েন সাধারণ জনগণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবার জন্য (রহমান ১৯৮৪), এবং কেরালার প্রগতিশীল পথের ওপর দাঁড়াবার পেছনে সেখানকার বুদ্ধিজীবিদের এই অবদান নগণ্য নয়। এরকম একটি 'সায়েন্স ফর সোসাল রিভল্যুশন' কী এদেশে হতে পারে না যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শ্রদ্ধেয় প্রগতিশীল শিক্ষকবর্গ এব্যাপারে উদ্যোগ নেন।

৩. গণগবেষণা

এদেশে 'গণগবেষনা' বা 'পার' নতুন শুরু হয়েছে এবং এর সার্বিক মান আরো অনেক উন্নত এবং প্রগতিশীল করা প্রয়োজন, কিন্তু শুধু এন,জি,ও-দের হাতে থাকলে তা হবার সম্ভাবনা কম। আর এন,জি,ও-দের হাতে গণগবেষণার মাধ্যমেতো বৃহত্তর পটে সমাজ পরিবর্তনে কোন অবদান রাখবার কোন সম্ভাবনাই নেই। দেশের শোষিতদের গণগবেষনার মতো প্রগতিশীল প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করবার কাজ কেন দু-একটা এন,জি,ও-র হাতে ছেড়ে দেয়া হবে - একাজ কেন দেশের বাম মহল দখল ক'রে একে আরো প্রগতিশীল পথে নিয়ে যাবে না?

৪. যৌথ কর্মকান্ড বিস্তারের জন্য কাজ করা

"আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন - কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।" - শেখ মুজিবর রহমান, ৩০শে জুন ১৯৭২এ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

এদেশে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলা ও লেখা হচ্ছে। দেশে বাজারের অগ্রগতির জন্য এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক হবার জন্য অনেকে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলেই আখ্যায়িত করেন, কিন্তু এদেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, আজো 'মালিক'দের সঙ্গে বঞ্চিত মানুষদের অধিকাংশের পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক - জমি-জলা-বাজার-প্রযুক্তি-তথ্যের তথা তাদের সামগ্রিক জীবনের ওপর কন্ট্রোল - বিদ্যমান, এবং দেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের নামে সুস্পষ্ট পরিবারতন্ত্রের অধীনে এই 'মালিক'দেরই আধিপত্য একটি 'আধা সামন্তবাদী' সমাজের পরিচয় ধারণ করে। এরকম অবস্থা থেকে সমাজের অগ্রগতির জন্য বড়ো রকমের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন যে সংস্কারে ভূমি-জলা পুনর্বন্টন যতখানি সম্ভব তা সহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আর্থ-সামাজিক সলিডারিটি গ্রুপের আওতায় আনা প্রয়োজন পারস্পরীক সাপোর্ট এবং যৌথ কর্মকান্ড নেবার জন্য যাতে তাদের জীবন-সংগ্রামে কোন 'মালিক' শ্রেণীর ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে না হয়। সমাজে এইদিকে চেতনার বিস্তারের জন্য, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এবং বঞ্চিতদের মনে এই পথের ওপর বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ভরসা জাগাবার জন্য, তাদের বাস্তব জীবনে এরকম যৌথ কর্মকান্ডের বিস্তারে প্রগতিশীল শক্তিবর্গেরই প্রধান ভূমিকা নেয়া উচিত নয় কী। কেবলমাত্র এইভাবেই সমাজকে এই পথে নেবার সম্ভাবনা ও শক্তি বাড়বে, শুধু কথায় ও শ্লোগানে নয়। তাদের দারিদ্র বিমোচনের কথা বলেও নয়, তারা তাদের যা আছে তাই নিয়েই তাদের যৌথ সৃষ্টিশীলতা দিয়ে বিশ্বকে চমকে দিতে পারে এবং নিজেদেরও শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়ে তাদের জীবনে চরিতার্থতা আনতে পারে এই আহবান দিয়ে। আসলে, এই মানুষদের 'দরিদ্র', কিংবা 'বঞ্চিত' এরকম আখ্যা না দিয়ে, যে অপরাধ আমিও ক'রে চলেছি এব্যাপারে চিন্তা না ক'রেই, আর্থ-সামাজিকভাবে 'বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত' এরকম আখ্যা দেয়াই উচিত নয় কি।

মুক্তিযুদ্ধের পর বিশেষ অনুপ্রেরণার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গণচাপের জন্য সুবিধাভোগী শ্রেণীরও কিছু অংশ-যে গণমানুষদের সঙ্গে যৌথ উদ্যাগে যোগ দেয় গেণ সামাজিক অবস্থা আজকে নেই বিধায় আজকে 'বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত' মানুষদের আলাদা যৌথ উদ্যোগণ প্রয়োজন। সম্প্রতি আবুল বরকত এদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কত অসংখ্য রকম যৌথ উদ্যোগ হতে পারে যা গণমানুষকে এবং সমস্ত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার একটি বিশদ ফিরিস্তি দিয়েছেন (বরকত ২০০৯) যা এরকম মানুষদের গণগবেষনায় বিবেচনার জন্য পেশ করা যায়। এছাড়া এরকম মানুষদের কাছে দেশের অন্যান্য স্থানের প্রগতিশীল গণউদ্যেগের সংবাদ নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং এরকম উদ্যোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন তাদের থেকে অনুপ্রেরণা ও পদ্ধতিগত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা নিতে। অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল যৌথ উদ্যোগের সংবাদও তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তাদের এপথে এগুতে উদ্বুদ্ধ করতে, চিন্তা করতে এবং পদ্ধতিগত দিকনির্দেশ করতে। আজকে এসব খবরও ইন্টারনেটেই জানা যায় এবং এই বিরাট বিশ্ব-পাঠাগার আজ সকলের দোরগোড়ায়। আর্থসামাজিকভাবে বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে সরাসরি এই পাঠাগার নিয়ে আসবার জন্য এদেশে এখন গণগবেষণা-ভিত্তিক কমিউনিটি ই-সেন্টার মডেল-ও পাইলট পর্যায় পার হয়েছে (মাহমুদ ২০০৮) যার প্রসারে প্রগতিশীল মহলের সহযোগীতা মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রগতিশীল কর্মকান্ডের ইতিহাসও জনগনের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তাদের নতুন ক'রে এপথে প্রেরণা দেবার জন্য। রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলনের এবং বিশেষ ক'রে তার দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার অসাধারণ দীপ্ত ইতিহাস যে কোন প্রগতিশীল দেশের জন্য প্রেরণা হতে পারে। প্রতি বছর 'তেভাগা' আন্দোলনকে স্মরণ করবার মতো এদেশে এই আন্দোলনকেও স্মরণ করা প্রয়োজন এদেশেরই মানুষ তাদের চরম বিপর্যয়ের সময়েও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত না ক'রে মাথা উঁচু রেখে যৌথভাবে কীকরে এরকম দুর্যোগের

মোকাবিলা করেছে তার গৌরবময় দৃ'ষ্টান্ত হিসাবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং বারে বারে তাদের এই আন্দোলন থেকে প্রেরণা নিতে ।

দেশের গণমানুষদের যৌথ উদ্যোগের প্রশ্নটির সঙ্গে গ্রাম-বাংলায় ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নটিও জড়িত যে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা ওপরে বলেছি। বর্তমান ক্ষমতাসীন পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে এই সংস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবে সংসদে 'মালিক' শ্রেণীর প্রতিভুরা এপথে এগুতে বাধা দিয়ে যাবে নিশ্চয়। এব্যাপারে দেশে চেতনা বিস্তারের এবং সরকারের ওপর দাবী/চাপ চালিয়ে যাওয়া যেমন প্রয়োজন, গেণ সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এরকম সংস্কার যদি এবং যখনি হয় তাকে ব্যর্থ করবার প্রচেষ্টা থাকবেই, এবং ভূমি-জলা নতুন ক'রে ভূমি-জলাহীন যাদের হাতে আসবে তাদের অনেকেও দারিদ্রের জন্য এই নবলব্ধ সম্পদ ধরে রাখতে পারবে না যদি তারা এই সম্পদ যৌথভাবে ম্যানেজ না করে। এই জন্যেও যৌথ উদ্যোগের বাস্তব অভিজ্ঞতা যত সঞ্চয় করা যায় এবং দেশে ছড়ান যায় ততোই ভূমি-জলা সংস্কার কখনো হলে তার সাফল্য নিশ্চিত করা যায়।

৫. গণশিক্ষা আন্দোলনে নেমে যাওয়া

একটি ব্যাপারে দেশে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সারা দেশে নেমে যাওয়া প্রয়োজন। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে আমাদের ভাষা আন্দোলন দিয়ে, কিন্তু আজো দেশের অর্দ্ধাংশেরও বেশি মানুষ লিখতে পড়তে পারে না, ফলে-যে শুধু দলিল না দেখে টিপ্ গণ দিয়ে জমি কুচক্রীদের কাছে হস্তান্তর হয়ে যায় তাই নয়, গণশিক্ষাই তো যে কোন দেশের উন্নয়নের ভিত্তি। বিশ্বে যেসব দেশ উঠে দাঁড়িয়েছে - পাশ্চাত্যে সতের-আঠার শতাব্দীতে জার্মাণী থেকে আমেরিকা এবং গত শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার 'টাইগার' দেশগুলি, এবং সাম্প্রতিক কালের এই অঞ্চলের আরো দেশসমূহ - এই সব দেশেরই উঠে দাঁড়াবার পেছনে দেশব্যাপী গণশিক্ষার প্রসারের মৌলিক অবদান রয়েছে। আর দেশে যদি কোনদিন বড়ো রকমের সমাজ-পরিবর্তনের সুযোগ আসে তখন সত্যিকারভাবে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীই যেন ক্ষমতায় আসে, তাদের নাম ক'রে কোন বুদ্ধিজীবি-আমলা শ্রেণী নয়, এই নিশ্চয়তার জন্যেও তো ব্যাপক গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত।

আজ দেশে আধুনিক সাক্ষরতা দানের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে ২০/২৫ জনের একটি গ্রুপকে এক/দেড় মাসের মধ্যেই লিখতে-পড়তে শেখান যায় - অধ্যাপক আহসানুল হকের 'ছবি দিয়ে পড়া শিখি' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ২০০৮ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে দেশের নানান্ স্থানে দেশপ্রেমিক তরুণরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একটি গণশিক্ষা আন্দোলনে নেমেও গিয়েছে (টুটুল ২০০৯)। আনন্দের কথা এই-যে এই আন্দোলনে একটি দেশব্যাপী প্রগতিশীল তরুণ সংগঠনও (বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন) নামছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কোন বাম পার্টি এখনো নামে নি, দলগতভাবে বাম বুদ্ধিজীবিরাও নয়। কিন্তু কী বিরাট সুযোগ এসেছে আজ দেশের কাছে সমস্ত দেশকে দু-তিনটা বড়ো ছুটির ধাক্কাতেই শিক্ষিত করে তোলবার। এই প্রশ্নেও কী দেশের বাম শক্তিবর্গ আগে 'সমাজ-বিপ্লবটা হোক তারপর দেখা যাবে' বলে বসে থাকবে। তার আগে সমস্ত দেশকে শিক্ষিত করে ফেললে কী দেশে সমাজ-বিপ্লবের সম্ভাবনা কমে যাবে, দেশে গণশিক্ষার বৈপ্লবিক প্রসার কী শোষিতদের হাতে দেশের উৎপাদন শক্তির বিকাশকেও ত্বরান্বিত করবে না। জনগনের পাশে প্রগতিশীল শক্তিবর্গ এভাবে এসে দাঁড়ালে উভয়ের মধ্যে এই বাস্তব ইনটারাক্শনের ফলে সমস্ত সমাজ শিক্ষিত হয়ে উঠে দাঁড়ালে সমাজের প্রগতিশীল পথে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা কী অনেক বেড়ে যাবে না।

উপসংহার: নতুন সম্ভাবনা?

আজকে দেশের নতুন তরুণ সম্প্রদায় আবার মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রেরণা নিতে চাইছে এবং এদের একটি বড়ো অংশ মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ নিয়ে এই যুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিক শক্তিকে ভোট দিয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুযায়ী গণমানুষেদের যৌথ উদ্যোগ দেখতে আগ্রহী বলে শোনা যায়। 'অগ্নিকন্যা'রও ব্যক্তিগত সমাজ-দর্শন এই দিকে বলে জানা। কিছু 'বাম' মহলও বর্তমান সরকারের মিত্রশক্তি হিসাবে সঙ্গে রয়েছে। অপরদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতার প্রসার, মিডিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এমন কি কিছু বিদেশি সংস্থারও উদ্বেগ দুর্নীতিপরায়ন শোষক মহলকে আগের চাইতে দুর্বল করেছে। 'মাইনাস টু'-র পক্ষে ও বিপক্ষের শক্তিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষমতাসীন মহলকে দুর্বল করেছে। স্থানীয় সরকারের লাভজনক কর্তৃত্ব নিয়েও এই মহল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আমলাতন্ত্রও দুই প্রধান পার্টির মধ্যে আনুগত্যের প্রশ্নে বিভক্ত। সর্বোপরি, দেশে মৌলবাদী শক্তির ভয়াল আগ্রাগণ সরকারি মহলের অনেককে জনগনের ওপর আগের মতো শোষণ করে যাবার চাইতে নিজেদের প্রাণ রক্ষার কাজে বেশি ব্যস্ত রাখছে। অপর দিকে বিশ্ব-একাডেমিক মহলেও আজকে উন্নয়ন বলতে সমাজে সম্পদের সুষম বন্টনের - ইকুইটির - ওপর জোর দেয়া হচ্ছে (গ্রেইগ ও অন্যান্য ২০০৭) যেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মূল মন্ত্রই ছিল বৈষম্য নিরগণ। গ্লোবাল মেল্টডাউনের ফলে বিধ্বস্ত বিশ্ব-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একচেটিয়া নেতৃত্বও শিথিল হয়ে পড়েছে এবং বিশ্বমঞ্চে জাতিসংঘের মানবাধিকারবাদী দর্শণ শক্তি পাচ্ছে। বিশ্ব-পুঁজিবাদ আজকে নি:সন্দেহে অধোগতির পথে এবং দিশাহারা হয়ে নানারকম জোড়াতালি দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে যে চেষ্টায় ওবামার মরীয়া হয়ে নেতৃত্ব মনে হয় যথেষ্ট নয়। এরকম সামগ্রিক অবস্থায় বাংলাদেশের উপরিকাঠামোও আজকে শোষণের পথে আগের মতো অবলীলায় এগোতে পারছে না। এই পরিবেশে প্রয়োজনমতো অধিপতি মহলের ভেতরে ও তাদের সহযোগীদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তধারী যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আঁতাত করে দেশের গণ মানুষদের যৌথ কর্মকান্ডের প্রসার ঘটিয়ে সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর করবার আবার সুযোগ এসেছে যেরকম সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের পর এসেছিল। দেশের উৎপাদন শক্তিকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে উপরিকাঠামোর দ্বন্দ্ব তীব্রতর করে যাওয়াই বর্তমান সময়ের কাজ - এতে শোষিত মানুষদের যৌথ আত্মশক্তির ওপর ভিত্তি ক'রে দেশের উৎপাদন শক্তির বিকাশ হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল উপরিকাঠামোকে পরাজিত করবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে ব'লে এটাই বর্তমানে সমাজের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির পথ। দেশ এভাবেই, ফালস্ বর্দার ভাষায় 'দেশজ প্রেরণাজাত সমাজতন্ত্রের' - দিকে এগুতে পারে, যে সমাজতন্ত্র সত্যিকারের উৎপাদন শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে টেঁকগণ হবে, উৎপাদন শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বুদ্ধিজীবি-আমলা শ্রেণীর অধীনে থেকে আবার উৎপাদন শক্তি দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হবে না।

সবশেষে এই কথা আবার বলে শেষ করছি, যে শহীদ বুদ্ধিজীবিরা তথা মুক্তিযুদ্ধে দেশের সব শহীদরাই, শুধুমাত্র একটি স্বাধীন দেশ পাবার জন্য আত্মত্যাগ করেন নি, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ পাবার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁদের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা দেখানো হবে যদি আমরা এরকম একটি সমাজ গড়বার স্বপ ও প্রচেষ্টাকে ফিরিয়ে আনি দেশকে এপথে নেবার জন্য জনগনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই সমাজতন্ত্র কোন বিদেশি ছাঁচে না হয়ে 'দেশজ প্রেরণাজাত সমাজতন্ত্র' হলে কী কোন ক্ষতি আছে?

---

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মারক বক্তৃতা, ৭ জানুয়ারী ২০১০।

টীকা

১. কয়েকটি স্থানে যেমন চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, রংপুর ও পিরোজপুর জেলার চারটি ইউনিয়নে বিধবা, পরিত্যক্ত ও তালাকপ্রাপ্ত নারী যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাদের বিশেষ অবস্থার জন্য তীব্ররকম ভয়াবহ, গণগবেষণা প্রক্রিয়ার যোগ দিয়ে নিজেদের বিশেষ *'শ্রেণী'*-অবস্থান সম্বন্ধে - যে 'শ্রেণী'-অবস্থান অর্থনৈতিক সম্পর্কের চাইতে বেশি সামাজিক সম্পর্কজাত - সচেতন হয়ে পারস্পরীক সলিডারিটি গ্রুপ গঠন ক'রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। এভাবে গণগবেষণার মধ্য দিয়ে একটি টেক্সট বুক বহির্ভূত এযাবৎ পারস্পরীক বিচ্ছিন্ন একা-একা তীব্রতম জীবনযুদ্ধে লিপ্ত সামাজিক 'ক্লাস ইন্ ইট্সেল্ফ', নিজেদের একটি 'ক্লাস ফর ইট্সেল্ফ' গঠনের দিকে এগুতে শুরু করেছে যেটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাস্তব ও প্রত্যয়-নির্দেশক ঘটনা।

References

আকাশ, এম এম (২০০৯). *বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট ও অক্টোবর বিপবের প্রতি পুন:দৃষ্টিপাত। মহান অক্টোবর বিপব বার্ষিকী।* সমাজ সমীক্ষা সংঘ। ঢাকা। ১৩ নভেম্বর ২০০৯।

Barkat, Abul *et al*. (2008). *Development as Conscientization. The Case of Nijera Kori in Bangladesh.* Pathak Samabesh. Dhaka.

বরকত, আবুল (২০০৯). *বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন*। সমবায় অধিদপ্তর।

de Silva, G.V.S., Niranjan Mehta, Md. Anisur Rahman & Ponna Wignaraja. (1979) "Bhoomi Sena: A Struggle for People's Power". *Development Dialogue:* 2.

Fals Borda, Orlando (1988). *Knowledge and People's Power. Lessons with Peasants in Nicaragua, Mexico and ColoMYia*. Indian Social Institute. New Delhi. 1988.

Fals Borda, Orlando (2001). "Participatory action research in social theory: origins and challenges". in Reason and Bradbury 2001/2006). *Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice.* London: Sage.

Gramsci, Antonio (1971). *Selections from Prison Notebooks*. Lawrence & Wishart. London.

Greig, Alastair, David Hulme & Mark Turner(2007). *Challenging Global Inequality. Development Throry and Practice in the 21st Century*. Palgrave Macmillan New York.

Habib, Wasim Bin (2009).. “Smile, Hope All Over”. *The Daily Star* Oct 29: p 16. Dhaka.

Khan, Md. Shawkat Ali (2009). ***কুয়াকাটার মৎস্যজীবিরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা কেন নিয়ন্ত্রিত, তার মূর কারণ নিরূপণ এবং এদের বলয় থেবে বের হয়ে আসার পথ অনুসন্ধান।*** Research Initiatives Bangladesh. Dhaka.

Lenin. V.I. (1918). “What is to be Done?” *Selected Works*. Vol 1. Moscow. Progress Publishers.

মাহমুদ, মানিক (২০০৭). “গণগবেষণা: দারিদ্র দুরীকরণে হতদরিদ্রদের অনুসন্ধান”। *বাংলাদেশে গণগবেষণা* । *সেপ্টেম্বর ২০০৭*।

Mahmood, Manik (2009). ***ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক কমিউনিটি ই-সেন্টার মডেল এবং গণগবেষনা.*** UNDP Bangladesh. Dhaka.

Rahman, Md. Anisur

1979. "Bhoomi Sena,: A Struggle for People's Power". *Development Dialogue*. No. 2. (with de Silva, Mehta & Wignaraja).

1982. "The Theory and Practice of Participatory Action Research". Keynote Paper presented at the Tenth Congress of Sociology, Mexico, August.
Reproduced in Fals-Borda (ed): *The Challenge of Social Change.* Sage Publications. London 1985; and in Shadish & Reichard (ed*) The Evaluation Studies Review Annual*. Vol 12. 1988. Sage Publications, London. Also in website: www.anisurrahman.com

1984. “People’s Science Movements. Reflections on “Science for Social Revolution””. *Science as Social Activism, Reports and Papers*

on The People's Science Movements in India". Kerala Sastra Sahitya Parishad, Trivandrum. Also in website: www.anisurrahman.com

1989. "People's Self-development" (Professor Atwar Hossain Memorial Lecture). *Journal of Asiatic Society of Bangladesh (Hum.).* Vol XXXIV. No. 2. DeceMYer Also in website: www.anisurrahman.com

১৯৯৭.*যে আগুন জ্বলেছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ,* গণপ্রকাশনী, (সম্পাদনা)।

2000. *Participation Studies, Vol 1. Participation of the Rural Poor in Development* (republication of *Development, Seeds of Change, from Village to Global Order*, 1981:1, guest-edited by the author). Republished by Pathak Shamabesh, Dhaka.

২০০২. 'অমর একুশে ও জাতীয় আত্মবিকাশ' (অমর একুশে বক্তৃতা) *একুশে ও স্বাধীনতা, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ বাস্তবতা, অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৯৪.* এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন

2007. *Through Moments in History. Memoirs of Two Decades of Intellectual and Social Life* (1970-1990). Pathak Samabesh.

2008."The Praxis of Participatory Action Research". Peter Reason & Hilary Bradbury (eds). *Handbook of Action Research.* 2nd edition. Sage Publication. London.

তাহ্মিনা, কুররাতুল আইন ও অন্যান্য (২০০৮). *বঞ্চিতদের সৃজনশীল উদ্যোগ অনুসন্ধান, প্রচার ও প্রসার*। রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস্ বাংলাদেশ।

টুটুল, জহুরুল হাসান (২০০৯). 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাংলাদেশের তরুণ সমাজ'. *শিক্ষাবার্তা*। *সেপ্টেম্বর। ঢাকা।*